কাব্যের উপেক্ষিতা — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

1.৩ বিরহ বেদনার এক ভাষাহীন অব্যক্ত মর্মগাথা 'কাব্যের উপেক্ষিতা' প্রবন্ধ — আলোচনা করো।

প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য ও কবিদের জগৎ রবীন্দ্রনাথকে এক অমোঘ আকর্ষণে সবসময় আকর্ষণ করত, সুদূর উজ্জয়িনীর সরণী ধরে কবি ~~মন~~ হেঁটে যেতেন কৌশাম্বী, কোশল, মগধ ও লক্ষণ সেনের লক্ষণাবতী নগরে। আরোহন করে আনতেন ঐতিহ্য মণ্ডিত মনিমানিক্য সমন্বিত পুরাতন সংস্কৃত — সাহিত্যের অদৃষ্টপূর্ব নির্যাস। বলা বাহুল্য এই বিন্দু বিন্দু নির্যাসে গড়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলি। আমাদের আলোচ্য 'প্রাচীনসাহিত্য' (১৯০৭) এর অন্তর্গত 'কাব্যের উপেক্ষিতা' প্রবন্ধটি। ('রামায়ণ' প্রবন্ধে সমালোচনাকে পূজা বলে স্বীকার পূজারীর দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রাচীন সাহিত্যের সমালোচনা করেছেন।) এগুলিকে সরাসরি স্তুতি নাবলে 'Poetic Injustice' বা 'কবি অনৌচিত অবিচার' বলা ভাল।

— সংস্কৃত সাহিত্যের সমালোচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল — 'কাদম্বরী চিত্র', 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা', 'প্রাচীন সাহিত্য' ও 'কাব্যের উপেক্ষিতা' ইত্যাদি প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধগুলিতে প্রাবন্ধিকের গভীর মনোবিশ্লেষণে এই সকল আখ্যায়িকাগুলি আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে পুনরায় আবিষ্কৃত হয়েছে। সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবন্ধটিকে ঠিক সাহিত্য সমালোচনামূলক প্রবন্ধ বলে মেনে নিতে পারেন নি। সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন —

> ["কাব্যের উপেক্ষিতা (জৈষ্ঠ্য, ১৩০৭) রচনাটি ঠিক সাহিত্য সমালোচনা নয়, মহাকবি রচিত জীবন বৃত্তের খণ্ডিতাংশের শূন্যস্থান পূরণ। অভিনীত নাটকের নেপথ্যে লোক দর্শকের প্রত্যক্ষ দৃষ্টি বহির্ভূত তাহার কিয়দংশকে গাঢ় প্রদীপের আলোয় প্রকাশ।"]

— এই উক্তির স্বপক্ষে আমরা ও একমত। কেননা, একটি পুষ্পের সৌন্দর্যে আমরা আকর্ষিত ও মুগ্ধ হই, অথচ ~~আত্মরক্ষা করে~~ যে বৃন্ত এবং যে শ্যামল সবুজ পত্র তাকে প্রখর সূর্যালোক থেকে রক্ষা করে তার খবর কে রাখে। রবীন্দ্রনাথ হয়ত এই উপেক্ষিতা নারীদেরই সাহিত্যে স্থানে আশ্রয় দেবার তাগিদে প্রবন্ধগুলি রচনা করেছেন। উপেক্ষিতা নারীদের বিবরণ দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই বলেছেন —

> ["সংস্কৃত সাহিত্যের কাব্য যজ্ঞশালার প্রান্তভূমিতে যে কয়টি অনাদৃতার সহিত আমার পরিচয় হইয়াছে, তাহার মধ্যে ঊর্মিলাকে আমি প্রধান স্থান দিই।"]

ঊর্মিলার প্রথম সাক্ষাৎ পাই বিদেহ নগরীর বিবাহ সভায়। মালাচন্দন শোভিত সলজ্জ চাহনিতে সেই যে একবার রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করলি

Scanned with CamScanner

তারপর এই নিঃশব্দচারিণী, নির্বাককুণ্ঠিতা, অবগুণ্ঠিতার আর দেখা মেলেনি। সীতা শুধু একবার পরিহাস করে লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "বধূ তুমি কে? লক্ষ্মণ লজ্জিত হাস্যে এর উত্তরে বলেছিলেন "ওগো, ঊর্মিলার কথা আর্য জিজ্ঞাসা করিয়াছেন"। এরপর অলক্ষ্যে তাকে যে অন্তঃপুরে পাঠালেন আর তার ক্ষীণ আভাস টুকুর প্রতিচ্ছবি পাওয়া গেল না। বলাবাহুল্য রামের অভিষেক মঙ্গলাচরণে অন্তঃপুর অন্যান্য পুরনারী লক্ষ্মীদের সাথে ঊর্মিলাও মঙ্গলাচরণে নিশ্চয়ই ব্যস্ত ছিলেন। আবার যেদিন অযোধ্যা অন্ধকার করে তার স্বামী রাম — সীতাকে নিয়ে বনবাসে গেলেন সেদিন নববধূ ঊর্মিলা অন্তঃপুরে কোনো না কোনো নিভৃত শয়ন কক্ষে ধূলিমলিন শয্যায় বৃন্তচ্যুত মুকুলের মত লুটিয়ে বাকহারা অশ্রু মন্দাকিনী প্রবাহ ছুটিয়েছেন তার খবর কোন কাব্য মহাকাব্যের কবি — মহাকবীর কানে পৌঁছায় নি। তাই রবীন্দ্রনাথের অভিমানে ক্ষুব্ধ জিজ্ঞাসা —

"সেইদিনকার সেই বিশ্বব্যাপী বিলাপের মধ্যে এই বিদীর্যমান বৌদ্রিকমল হৃদয়ের শোককে দেখিয়াছিল! যে আদিকবি ক্রৌঞ্চ বিরহিনীর বৈধব্য দুঃখ মুহূর্তের জন্য সহ্য করিতে পারেন নাই, তিনি ও একবার চাহিয়া দেখিলেন না"।

— আবার অলক্ষ্যে নতুন প্রেমে বধূ স্বর্ণোন্মুখ কুঁড়িটি যখন প্রিয় মিলনের আবেগে পুলকিত, রোমাঞ্চিত, চঞ্চিত, মুহুর্মুহু শিহরিত ঠিক তখনই এই নবীনতাকে ফেলে রেখে লক্ষ্মণ বনে গমন করলেন। তারপর যখন বারো বছর পরে ফিরে এলেন তখন সেদিনের সেই নবপ্রভাতের শিশির ভেজা সিক্ত কুসুমটি কি ছিল। এ যেন কিংবদন্তি কবিতা —

"অঙ্কুর তখন
আগে যদি জাগবে
কি করিব বাহির মেয়ে!"

— সত্যিই সেদিনে বাহির মতো ঊর্মিলাও অবহেলায়, অনাদরে, অবজ্ঞায় ক্ষয়ে ক্ষয়ে ভিতরে ভিতরে মরে গিয়েছিল — এ যেন রবীন্দ্র নাথেরও কবিতা —

"ক্ষয়ে ক্ষয়ে ছায়া মরে গেছে পদতলে।"

— তখন কি আমরা একবার ও ভাবি এই চিরবঞ্চিতার মর্মবেদিনী আর দুঃখদীর্ণ অশ্রুজাগরণ দীর্ঘদিনের প্রহর জাগরনের কথা। রবীন্দ্রনাথ এপ্রসঙ্গে বলেন —

"পাছে সীতার সহিত ঊর্মিলার পরম দুঃখ কেহ তুলনা করে, তাই কি কবি সীতার স্বর্ণমন্দির হইতে এই শোকোজ্জ্বল দুঃখিনীকে একেবারে বাহির করিয়া দিয়াছেন — জানকীর পাদপীঠপার্শ্বেও বসাইতে সাহস করেন নাই।"

— বাল্মিকীর কাব্যের মতই কালিদাস ও যে সব চরিত্রের প্রতি সমান মর্যাদা দান করেন নি তাও রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন। যে সকল চরিত্র সক্রিয় প্রকাশের বেদনায় অস্থির, চঞ্চল প্রধান চরিত্রের পরিস্ফুটনে সাহায্য করেছে তারাই অনেক ক্ষেত্রে বঞ্চিতা অবহেলিতা উপেক্ষিতা।

Scanned with CamScanner

উদাহরণ স্বরূপ তিনি শকুন্তলার দুই প্রিয় সখী তপস্বিনী প্রিয়ংবদা ও অনুসূয়ার কথা বলেছেন। তাই রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই প্রশ্ন করেছেন শকুন্তলা অনুসূয়া ও প্রিয়ংবদা যখন জলের ঘট নিয়ে নবমালতীর তলায় এসে দাঁড়াত তখন দুষ্মন্ত শকুন্তলাকেই কি শুধুমাত্র ভালোবেসেছিল। বলা বাহুল্য অবশ্যই না। প্রাবন্ধিক এ প্রসঙ্গে বলেছেন —

"একা শকুন্তলা শকুন্তলার এক – তৃতীয়াংশ। শকুন্তলার অধিকাংশই অনুসূয়া ও প্রিয়ংবদা, শকুন্তলাই সর্বাপেক্ষা অল্প। বারো আনা প্রেমালাপ তো তাহারাই সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দিল।"

— রবীন্দ্রনাথের এ মন্তব্য যথার্থ। একা শকুন্তলা কখনো রক্ত-মাংসের সুনাম শকুন্তলা হতে পারত না। তার রক্ত মাংসের দেহে প্রাণস্পন্দন এনেছে প্রিয়ংবদা ও অনুসূয়া। তারা দুই প্রিয় নরনারীর প্রেমালাপে প্রধান সহায়ক, তাদের সহায়তা বিনা শকুন্তলা – দুষ্মন্তের গান্ধর্ব বিবাহ সুসম্পন্ন হওয়া দূরে থাক প্রেমালাপ হত কিনা সন্দেহ। তার প্রমাণ পাই তৃতীয় অঙ্কে একটি ছন্দে, এই দুই সখী না থাকায় শকুন্তলা দুষ্মন্তের প্রেমালাপ হয়ে কবির অসহায়তাবোধ প্রকট হয়ে ওঠে। তাই কবি কোন ক্রমে গৌতমীকে এনে পরিস্থিতি সামাল দেয়।

— রবীন্দ্রনাথের মনস্তত্ত্ব বুদ্ধির চমৎকার সংযোগ ঘটেছে তখন যখন শকুন্তলা একা দুষ্মন্তের কাছে আসলে দুষ্মন্ত তাকে চিনতে পারেনি — এই কথায়। কারণ তপোবন ও সখীদ্বয় ছাড়া শকুন্তলার অস্তিত্ব প্রায় নেই। তাই রবীন্দ্রনাথ দৃঢ় প্রত্যয়ে জানিয়েছেন —

"আমি তো মনে করি, রাজসভায় দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে চিনতে পারেন নাই তাহার প্রধান কারণ সঙ্গে অনসূয়া – প্রিয়ংবদা ছিল না। একে তপোবনের বাহির, তাহাতে খণ্ডিতা শকুন্তলা চেনা কঠিন হইতে পারে।"

— শকুন্তলার অভাবে তপোবনে অন্ধকার নেমে আসে, তাছে গাছে, ফুলে – ফলে, বন্যপশুদের মধ্যে আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। হায় প্রিয় সখী। তারা গাছে জল দিতে ভুলে যায়। হরিণ শিশুরা পরিপূর্ণ আদর থেকে বঞ্চিত হয়। মনে রাখতে হবে তারা শকুন্তলার ছায়া মাত্র নয়, তারা রক্ত মাংসে পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বপূর্ণ মানুষ। তবুও মহাকবি কালিদাস শকুন্তলার ব্যক্তিত্ব যাতে ম্লান না হয়ে যায় তাই অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাকে অনাদৃত, অবহেলিত, উপেক্ষিত করে রাখলেন।

বানভট্টের বিখ্যাত কাব্য 'কাদম্বরী' র আরও একজনে উপেক্ষিতা পত্রলেখা। শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ পত্রলেখার ব্যক্তিত্ব এবং অস্তিত্বের সংকটের আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত হয়ে জানিয়েছেন —

> "সে যেখানে আসিয়া অতি অল্প স্থানে আশ্রয় লইয়াছে, সেখানে তাহার আসিবার কোনো প্রকার প্রয়োজন ছিল না। স্থানটি তাহার পক্ষে সংকীর্ণ, একটু এদিক - ওদিকে পা ফেলিলেই সংকট।"

— অর্থাৎ তাকে যেন মানসিক প্রয়োজনের তাগিদে নারী পুরুষের এক অস্বাভাবিক নিরাপদ অর্থাৎ সম্বন্ধকাব্য রূপে দেখানো হয়েছে। সমালোচক শ্রী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন —

> "দুই খরস্রোতার নদী প্রবাহের মধ্যবর্তী নদীগ্রাস কবলিত প্রায় এক সংকীর্ণ ভূমি। এটাই যেন তাহার চিরনিরাপদ আবাসভূমি, তাহার আত্মার চির নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল, কবি এই মিথ্যা কল্পনাকেই সত্যের মর্যাদা দিয়েছেন।"

— নারীর ব্যক্তিসত্তার প্রতি চূড়ান্ত অবমাননা বানভট্ট 'পত্রলেখা' - র মাধ্যমে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। যে নারী চাইলেই যুবরাজ চন্দ্রাপীড়কে আপন বাহুডোরে আলিঙ্গন করতে পারত, যার শ্বাস - প্রশ্বাসে নিজেকে জড়াতে পারত, নিজ দেহজ কামনা বাসনার রক্তরাগে যাকে সহজেই দুলিয়ে মারতে পারত, তাকে কবি কেন শুধুমাত্র যৌবনতপ্ত প্রণয়পিপাসার্ত দুটি নরনারীর মাঝখানে রেখে অপমান করলেন তা সত্যিই আশ্চর্যের ব্যাপার। তাই প্রাবন্ধিকের মতে তাদের সখীত্ব শুধু দুই সমুদ্রের মধ্যবর্তী একটি বালুতটের মতো।

— পত্রলেখা কারো পত্নী হবার যোগ্য নয়, যোগ্য নয় প্রণয়িনী হবারও, যোগ্য নয় কিংকরী হবারও, সে শুধুমাত্র পুরুষের নর্ম সহচরী হয়ে বেঁচে থাকল। সে কোনো দিনই কোনো পুরুষের হৃদয়ের মধ্যে পদার্পণ করতে পারলো না। তাই প্রাবন্ধিক আক্ষেপ করে বলেছেন —

> "কোনো দিন একটু অসতর্ক বসন্তের বাতাসে এই সখীত্ব পর্দার একটি প্রান্তও উড়িয়া পড়িল না"।

— পত্রলেখার সঙ্গে কাদম্বরীর পরিচয় হবার পর কাদম্বরী তাকে প্রতিদ্বন্দ্বী না ভেবে প্রিয়সখীর মর্যাদা দিয়েছিল। পরবর্তীকালে কাদম্বরী ও চন্দ্রাপীড়ের প্রণয় বিবাহের মধ্যে দিয়ে পূর্ণতা পেলেও কবি বানভট্ট পত্রলেখার জন্য একটি মাত্র শ্লোকের অবতারণার প্রয়োজন অনুভব করেননি। এভাবেই পত্রলেখা স্বর্গে বাস করেও স্বর্গের পারিজাত গন্ধ থেকে বঞ্চিতা।

— বানভট্টকে অন্ধ বলা হয়েছে কারণ কাদম্বরী ও মহাশ্বেতা - র দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার চোখ ঝলসে গেছে। তিনি উপেক্ষিতা

অনাহৃতা বাসরজ্জাগা স্বপ্ন সুখে-ধ্বংস বন্দিনী পত্রলেখাকে দেখতে পাননি, তার ফলে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন —

"তাই কাদম্বরী পড়িয়া কেবলই মনে হয়, অন্য সমস্ত নায়িকার কথা অনাবশ্যক বাহুল্যের সহিত বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু পত্রলেখার কথা কিছুই বলা হয় নাই"।

'কাব্যে উপেক্ষিতা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাচীন যুগের যথার্থ গীতিকবিতার মন নিয়ে নৈর্ব্যক্তিক ভাবে প্রাচীন নারীদের মর্মবেদনা নিস্পৃহ ভাবে মনোবিশ্লেষকের ন্যায় আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, তাই আজ তারা আর কাব্যকাহিনীর পৃষ্ঠায় মুখ বুজে রোদন করে না, তারা পাঠকের রক্ত-শিরায়, সুখে-দুঃখে সতত্ই বিরাজমান। যাঁরা দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের প্রাজ্ঞ চেতনায় প্রাচীন এই চারটি রমনী তাই আজ আর উপেক্ষিতা নয়, সেই যুগে তারা উপেক্ষিতা হলেও তাদের মর্মবেদনা, অতুল ভাষাহীন আত্মবিলাপ তাদেরকে দুর্লভ মহিমায় উত্তীর্ণ করেছে।"